‘রাধামন-ধনপুদি পালা’ : চাকমা নৃগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির আলেখ্য।

STURJ, Vol. 1, Issue-2, DoP: 06.08.2021

পদ্ম কুমারী চাকমা

ও

মলয় দেব

সারসংক্ষেপ

‘রাধামন-ধনপুদি পালা’ চাকমাদের জাতীয় জীবনের আখ্যান। এই আখ্যান সৃজনে বাংলার মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য, বারমাসী গান ও গীতিকা সাহিত্যের প্রেমভাবনার দ্বারা গেংখুলীদের কল্পনাপ্রবণ মন পরিপুষ্ট হয়েছিল একথা সত্য। তবে চাকমা নৃগোষ্ঠীর কিংবদন্তী ও ইতিহাস; জীবন ও সংস্কৃতিকে এমন নিখুঁতভাবে আত্তীকরণ করে ‘গেংখুলী’গণ (চারণ কবিগণ) এই পালাটিকে রূপ দিয়েছেন যাতে আখ্যানটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্মের মর্যাদা লাভ করেছে। রাজা বিজয়গিরির সেনাপতি রাধামন ও চম্পা নগরের রাজা সাদেংগিরির ও মেনেকার কন্যা ধনপুদির প্রেমের কথা, আরণ্যক জনপদে লোকমুখে বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিল। তারপর জনৈক গেংখুলী কাহিনিটি পালায় রূপান্তরিত করেন।

চাকমাদের অতীত ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবোধের স্মারক আলোচ্য পালাটি। চাকমাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের আচার, বিবিধ সংস্কার-বিশ্বাস, জুম নির্ভর কৃষি অর্থনীতির পাশাপাশি প্রেমিকের হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিরহ-মিলনের মধ্য দিয়ে ‘রাধামন-ধনপুদি পালা’র কাহিনি মহাকাব্যিক ব্যপ্তি লাভ করেছে। ইতিহাসের বহুবর্ণিল চরিত্রের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখকে গেংখুলীগণ নিজস্ব কবি কল্পনায় এমনভাবে রূপায়িত করেছেন যাতে চাকমা নৃগোষ্ঠীর নর-নারীর নিত্যকালের সামগ্রী হয়ে উঠেছে আলোচ্য আখ্যানটি। চাকমাদের স্বীয় সমাজবৃত্তের মধ্যেই এই পালার আখ্যান বিকাশ লাভ করেছে আর এই আখ্যানের চলনকে প্রসারিত করেছে নানা উপকাহিনি। এভাবে মূল কাহিনির সঙ্গে একাধিক উপকাহিনির সমাহারে চাকমা নৃগোষ্ঠীর সমাজ-পরিবেশে, ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদির আলেখ্য হয়ে উঠেছে ‘রাধামন-ধনপুদি পালা। এই সন্দর্ভ প্রণয়নে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: চাকমা নৃগোষ্ঠী, রাধামন-ধনপুদি পালা, গেংখুলী, জুম অর্থনীতি, চাকমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিভাবনা।

১

ভারতবর্ষে বসবাসকারী প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। আবার কারও কারও রয়েছে নিজস্ব লিপি। একই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে বৃহত্তর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সমান্তরালে স্ব-স্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে এই নৃগোষ্ঠীগুলি তাদের জাতিসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। চাকমারাও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারত রাষ্ট্রসীমার বাইরে চাকমারা বিশেষ করে বাংলাদেশে ও ব্রহ্মদেশে বসবাস করে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত (Ishaq, 1971, 32).

বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে মধ্যযুগে মৌখিক ও লেখ্য এই দুই ধারায় সাহিত্যের চর্চা হলেও বাংলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বেশিরভাগ নৃগোষ্ঠীর মতো চাকমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা মৌখিক ঐতিহ্যকে

ধারণ করে লালিত হয়েছে। চাকমাদের ‘গেংখুলী গীদ’, পালাগান, বারমাসী গান, লোককথা, লোকগীতি প্রভৃতি গায়েন পরম্পরায় আরণ্যক জনপদে বর্তমানেও দুর্লভ নয়। চাকমাদের প্রকৃতিবাদী জীবনভাবনার সঙ্গে আচরিত বৌদ্ধ ধর্মের এক অদ্ভুত মিলন ঘটেছে তাদের মৌখিক সাহিত্যে।

চাকমা লোকসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ধারা হলো পালাগান। প্রণয়মূলক নাট্য-গীতধর্মী ‘রাধামন-ধনপুদি পালা’টি চাকমা পালা সাহিত্যের আদি নিদর্শন (শর্মা, ২০০৮, ৫৬)। এই পালার দ্বিতীয় ভাগ ‘চাদিগাং ছারা’ চাকমাদের কিংবদন্তী ও ইতিহাস সম্পৃক্ত সৃষ্টিক্রম। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক পালা হলো ‘লক্ষ্মীপালা’। এই পালার বিষয়বস্তু থেকে চাকমাদের জীবন ও সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির প্রভাবের দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়াও ধর্মসম্পৃক্ত পালা ‘গোজেনের লামা’, জীবনরসাশ্রিত ‘লোরবো-মদিুঙী পালা’, ‘নরপুদি পালা’ চাকমা সমাজের জনপ্রিয় নাট্য-গীতধর্মী আখ্যান। তাল-বাদ্য সহযোগে সুর-ছন্দে জুম কৃষি অর্থনীতি নির্ভর আরণ্যক জনপদে চাকমা সমাজের লোকপ্রিয় চারণ কবিরা অর্থা□ গেংখুলীরা এগুলি পরিবেশন করে থাকেন। চাকমা সমাজে প্রচলিত ঐতিহ্যপূর্ণ এই পালাগানগুলি থেকে ত□কালীন সামাজিক রীতি-নীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শৌর্য-বীর্য, প্রেম-বিরহ ইত্যাদি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়। ‘রাধামন-ধনপুদি পালা’ও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। এই পালা “এক নাগাড়ে গেংখুলীরা সাত দিন সাত রাত গেয়েও ফুরাতে পারে না। ওইগুলিতে অজস্র কাহিনী এবং উপকাহিনী বৃক্ষের ডালপালার মত ছড়িয়ে আছে। অন্যান্য পালাগানগুলিও এত দীর্ঘ যে এগুলির লিখিত রূপ দেওয়া হলে প্রত্যেকটিকে এক একটি কাব্য বলা যেতো।”(চাকমা, ১৯৮৩, ৯৯)

‘রাধামন-ধনপুদি পালা’র গেয় বৈশিষ্ট্য, কাহিনি বিন্যাস, গীতিময়তা, ছন্দোমাধুরী সর্বোপরি নায়ক-নায়িকার প্রেমময় আবেগের বহিঃপ্রকাশে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য, প্রেমোপাখ্যান, বারোমাসী গান, পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রভৃতির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। গেয় বৈশিষ্ট্যজনীত কারণে একদিনে গায়কেরা সম্পূর্ণ আখ্যান পরিবেশন করতে পারতেন না বলেই কাহিনিকে একাধিক পালায় বিভক্ত করা হত। ফলত গায়কেরা এক এক দিনে এক একটি পালা বা খণ্ড দর্শক শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারতেন। বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের একমাত্র প্রাপ্ত নিদর্শন ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের কাহিনি বিন্যাসেও এর অন্যথা ঘটে নি। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ‘রাধামন-ধনপুদি পালা’ও গেংখুলীরা সপ্তাহব্যাপী পরিবেশন করেন।

২

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। নানারকম আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস, রীতি নীতির সমন্বয়ে গঠিত মানুষের একটি যূথবদ্ধ আশ্রয়স্থল হলো সমাজ। এগুলি ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। যে কোন জাতির সমাজ কাঠামো গড়ে উঠে এই বৈশিষ্ট্যগুলির সমাহারে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই পরিবর্তিত সময় ও সমাজের কথা ধরা পড়ে সাহিত্যে। মৌখিক সাহিত্য ও সৃজনশীল সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। যুগমানসের চাহিদা ও বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহকে স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য কৌম জীবনে লোকসাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। বহু শতাব্দী ধরে মুখে মুখে শ্রুতির মাধ্যমে সেসব সাহিত্য চাকমা সমাজে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে চাকমা সাহিত্যেরও লিখিতরূপে উত্তরণ ঘটে। এক্ষেত্রে উ□কৃষ্ট উদাহরণ ‘চাদিগাংছারা পালা’। পালাটি তালপাতার পুঁথিতে লিখিতরূপে পাওয়া গেছে। এছাড়া চাকমা ‘গেংখুলী’দের কাছ থেকে বিখ্যাত চাকমা কবি শিবচরণ ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ‘গোজেনের লামা’ সংকলন করেন। আমাদের আলোচ্য ‘রাধামন-ধনপুদি পালা’র ১ম খণ্ড ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে সুগত চাকমা ও সুসময় চাকমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পালাটির ২য় খণ্ড ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে চিরজ্যোতি চাকমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরায় প্রচলিত এই পালাটিকে গেংখুলীদের কাছ থেকে বহুচেষ্টায় সংকলন করে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে একত্রে মলাটবন্দী করেছেন ইন্দুমাধব চাকমা। তাঁর ঐকান্তিক

প্রচেষ্টায় আনুমানিক চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর এই পালাগানটি একত্রে প্রথম লেখ্যরূপ পায়। বাংলাদেশে এবং ভারতের ত্রিপুরায় সংকলিত ও সম্পাদিত এই আখ্যানের মূল কাহিনি অবিকৃত থাকলেও আখ্যানের বিন্যাসে, শব্দ ব্যবহারে ও বাক্য যোজনায় বিস্তর পার্থক্য চোখে পড়ে। এর মূলে রয়েছে মৌখিক সাহিত্য হিসাবে এক গেংখুলীর সঙ্গে আরেক গেংখুলীর মন ও মেজাজের পার্থক্য। শব্দ চয়ন ও পরিবেশন রীতি ব্যক্তিভেদে পৃথক হয় তাই ‘রাধামন-ধনপুদির পালা’র সংকলিত ও সম্পাদিত পাঠে এই পার্থক্য সূচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমরা প্রস্তাবিত সন্দর্ভে ইন্দুমাধব চাকমা সংকলিত পালার পাঠই ব্যবহার করেছি।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ‘রাধামন-ধনপুদি পালা’ দু’টি ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে রাধামন-ধনপুদির জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন থেকে প্রেম ও পরিণয়, ঘিলাখেলা, জুমকাটা, জুমের শূন্যভূমিতে বেড়ানো, রাধামনের ফুল তোলা, বিজু দিনের কথা, ধনপুদির বারমাস্যা ইত্যাদি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় ভাগে চম্পক নগরের যুবরাজ বিজয়গিরি রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্যে তার পরাক্রমশালী সেনাপতি রাধামনকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা এবং বারো বছর ধরে একে একে মঘরাজ্য খ্যয়ংদেশে, অক্সাদেশে, কাঞ্চনপুর, কালঞ্জর প্রভৃতি দেশ জয়ের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে বিজয়গিরি তাঁর পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের সংবাদ পান। রাজার অবর্তমানে চম্পানগরে অরাজকতা দেখা দেবার আশঙ্কায় প্রজাপুঞ্জ বিজয়গিরির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমরগিরিকে সিংহাসনে বসান। এই খবর পেয়ে বিজয়গিরি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করে স্বসৈন্যে বিজিত রাজ্যাভিমুখে ফিরে যান এবং ‘সাপ্রে-কূল’ নামক স্থানে গিয়ে নতুন রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। অন্যদিকে, রাধামন রাজার অনুমতিক্রমে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে দেখার বাসনায় চম্পানগরে ফিরে আসে।

‘রাধামন-ধনপুদি পালা’র কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধামন ও ধনপুদি একই সমাজ পরিবেশে বেড়ে উঠলেও সামাজিক বিধি নিষেধ তাদের অমলিন প্রেমের পথকে ব্যাহত করতে পারেনি। আখ্যানের নায়ক ইতিহাসনির্ভর চরিত্র হলেও গেংখুলীর সৃজনী কল্পনায় চরিত্রটি শুধুমাত্র ইতিহাসের পরিচয়বাহী চরিত্র না হয়ে, হয়ে উঠেছে চাকমা নৃগোষ্ঠীর চিরায়ত প্রেমিক চরিত্র। আখ্যানের শুরুর দিকে রাধামন তার খেলার সাথী ধনপুদির প্রতি প্রেমের প্রকাশে সরব না হলেও ‘ঘিলখোরা পারা’ থেকে তার মনে প্রেমের ব্যাকুলতা ধরা পড়ে। আবার ‘ফুল পারা’য় মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও প্রেমিকার হাস্যোজ্জ্বল আনন্দঘন মুখটি মানসপটে ভেসে ওঠায় সে নাকশা ফুল ছিঁড়তে যায়। এভাবে প্রেমের প্রতি দীপ্র নিষ্ঠায় তার চরিত্র মহত্তম হয়ে উঠেছে। তবে লোককবি রাধামনকে একনিষ্ঠ প্রেমিক চরিত্র হিসাবেই গড়েননি; সে চাকমা নৃগোষ্ঠীর যূথবদ্ধ সমাজজীবনে নানা ক্রিয়াকর্মের অংশীদার হয়ে সংযমে, দায়িত্বে-কর্তব্যে, নৈপুণ্যে, আচার-আচরণে, জুমচাষে, শৌর্য-বীর্যে, প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞানে মৃত্তিকাসংলগ্ন আরণ্যক জীবনের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। একই জীবনভাবনা থেকে লোককবির মানসলোকে বেড়ে উঠেছে চঞ্চলা, চপলা, সরলমতী, সুন্দরী নারী ধনপুদি। নৃগোষ্ঠীর সমাজ-পরিবেশকে অঙ্গীকৃত করে ধনপুদির জীবনমানস ও প্রেম ক্রম পরিণতির দিকে যাত্রা করেছে। সেও আর পাঁচটা চাকমা যুবতীর মত তরকারির খোঁজে ‘ফুল্ল্যুংং’ পিঠে ঝুলিয়ে জুমে যায়, কলার মোচা তুলতে গিয়ে বোলতা তার শরীরে হুল ফোটিয়ে দেয়, সেই বিষ ঝেড়ে নামানো হয়। আবার প্রয়োজনের জুমে যাবার দিন ভোরে উঠে ভাত রান্না করা, বিজু উৎসবে মনের মানুষকে জন্মে জন্মে পাবার আশায় গঙ্গামাকে ফুল নিবেদন, চলাফেরায় সামাজিক স্বাধীনতা উপভোগ - এসব কিছুর সম্মিলনে চাকমা নৃগোষ্ঠীর নারী যেমন মূর্ত রূপ পেয়েছে ধনপুদির চরিত্রে তেমনি তাদের ধর্মীয়ভাবনারও প্রতিফলন ঘটেছে। প্রেমের প্রকাশে অসঙ্কোচ, বিরহে ব্যাকুলা, প্রেমিকের কাছে নানাধরনের আবদার করা আবার পরক্ষণেই প্রেমিকের পরিশ্রান্ত শরীরের ঘাম মুছে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে ধনপুদির কোমল প্রেমসিক্ত অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার ‘ফুল পারা’য় ধনপুদির মনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য গাছের মগ ডালে উঠে নাকশা ফুল আনতে গেলে সর্প দংশনে অচৈতন্য হয়ে রাধামন জলে পড়ে যায়। এমতাবস্থায় কোনরকমের আর্তনাদ না করে সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাঁতার কেটে

প্রমোস্পদকে উদ্ধার করে সর্পবিষ ঝাড়ার মন্ত্র পড়ে রাধামনকে বিষমুক্ত করে। সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষাপটে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যক্তিগত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ধনপুদির প্রেমে শাশ্বত রূপ লাভ করেছে। এই দুই প্রধান চরিত্র ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রগুলি যথা রাধামনের বাবা জয়মঙ্গল, ধনপুদির বাবা ও মা, রাধামন ও ধনপুদির শৈশব ও যৌবনের নানা ক্রিয়া-কর্মের সাথী (নলিংধন-নলিংবি, ফুজকধন-ফুজকবি, মেইয়াধন-মেইয়াবি, ছেইয়াধন-ছেইয়াবি), ধনীরাম, চলাবাব প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে কোনটাই সমাজ বিচ্ছিন্ন চরিত্র নয়। প্রতিটি চরিত্র ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে চাকমা নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনভাবনার প্রেক্ষাপটে।

৩

জীবন মানে বেঁচে থাকা, জীবিকা মানে বৃত্তি। এই বাঁচার জন্য মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ নানা বৃত্তি অবলম্বন করে। চাকমাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার ধরনধারণ অন্যদের থেকে একটু আলাদা। অতীতে তাদের জীবন ও সমাজ কাঠামো জুমচাষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আলোচ্য পালার নায়ক-নায়িকাকেও লোককবিরা স্ব-সমাজের জীবন ও মানসভাবনার আলোকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। স্বভাবতই নৃগোষ্ঠীর জুমভিত্তিক যূথবদ্ধ আরণ্যক জীবন, গার্হস্থ্য, ব্যক্তি ও পরিবারের সম্পর্ক, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে ‘রাধামন-ধনপুদি পালা’য়। এই পালায় একদিকে চাকমাদের জুম নির্ভর জীবনের সঙ্গে যুক্ত অন্যদিকে দৈনন্দিক জীবন যাপনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় নানা উপকরণের উল্লেখ রয়েছে।

চাকমারা প্রধানত বনকে অবলম্বন করে বেঁছে থাকেন। বনের সাথে তাদের আত্মার সম্পর্ক। চাকমাদের অধিকাংশ নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ জুম এবং বন থেকে আহরিত। তাই চাকমাদের সমাজ জীবন ও সংস্কৃতিতে এর নিবিড় প্রভাব। তারা জুমের ফসল, বন আলু, কন্দ ইত্যাদি বহনের জন্য ‘কাল্ল্যং’, ‘ফুল্ল্যং’ ব্যবহার করে। কাল্ল্যং, ফুল্ল্যং মূলত বেত দিয়ে তৈরি ঝুড়িবিশেষ। এগুলি দৈনন্দিন কাজে যেমন হাট-বাজার, জুমের ফসল এবং গ্রামাঞ্চলে বিবাহ অনুষ্ঠানের দ্রব্য সামগ্রী বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন –

“য়াল মাদি পিগেলে ঝড়ান আনি থিগেলে
কই তোনপাত ভরেয়্যে পুল্যাঙ্য দিঘেলে
ছিয়ে তলে আঙারা ছড়াত পাদি চাবারা
পুল্যাঙ্যত দিলে আজু মাছ হাঙারা।
জদেনো কুর্জি মিগলি ছড়া পারত কড়লি
দিলে পুল্যাঙ্যত আজু আ’র চারা চারা বগলি।” (চাকমা, ২০১৪,৭৪)

বাংলা অনুবাদ : হলুদ মাটি মাখল হঠা□ বৃষ্টি থামল
তরকারির খারাংটা দেখোল
ছাইয়ের নিচে অঙ্গার ছড়ায় পাতি জাল
খারাং-এ রয়েছে কাঁকড়া মাছের পাল।

জুমে লাগাই মকই   ছড়ার পাড়ে কড়ালি

খারাং-এ রোশনাই নানা তরকারিরি।

পালায় দখো যায়, ধনপুদি জুমে গিয়ে তরকারি সংগ্রহ করে নিয়ে আসার জন্য দাদু চলাবাবকে প্রয়োজনীয় ফুল্ল্যং বানিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। চাকমা যুবক-যুবতীদের কাছে ফুল্ল্যং খুবই প্রিয়। এই ফুল্ল্যং বাঁশের সরু বেতে দিয়ে তৈরি করা হয়। পাহাড়-জঙ্গলে বাঁশ সহজলভ্য। তাই বাঁশ দিয়ে ফুল্ল্যং তৈরি করা হতো। চাকমাদের দৈনন্দিন জীবনে বনজ ওষুধ, কাপড়, অলংকার ইত্যাদি ছোট ছোট 'সাম্মুয়া' নামক ঝুড়িতে রাখার বন্দোবস্ত রয়েছে। ধনপুদি রাধামনকে সাম্মুয়া তৈরি করে দেওয়ার জন্যও আবদার করছে। পালাকারের বর্ণনায় –

ক) "চগিোন ছড়াত রগো দিচ্   মত্তান রানিলিং দিচ্

য়লে শাম্মুবুয়া বুনি দিচ্।" (তদবে, ৩০)

বাংলা অনুবাদ: ছোট ছড়ায় সেতু দিও   মদের ভাতে আগুন দিও

আমার জন্য সবুজ সাম্মুয়া বানিয়ে দিও।

খ) "বনোন বাজহৈ স্যং গারমে   মঝা মারি চাবরেমে

পিনোন খাদয়ি ভরদোক কাজ্যয়্যেন ফুল বাড়ং।" (তদবে, ৬৫)

বাংলা অনুবাদ: কোমর তাঁত বানালাম উঁচু করে   মশা মারলাম থাপড়ে

কাপড় চোকাল কারুকার্যময় বেতের ঝুড়ি খালি করে।

জুমের তুলা থেকে সুতা কেটে নানাবিধ পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করা হয়। যেমন মেয়েদের 'পিনিন-খাদি', পুরুষদের গামছা, মাথার 'খবং' ইত্যাদি। এগুলি 'বেইন' তথা কোমর তাঁতের সাহায্যে বানানো হয়। বেইন-এর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যেমন 'তাগলগ', 'চুচ্যং বাঁশ', 'ত্রাম', 'সসপদর', 'হাগারাদাদি' ইত্যাদি বন থেকে সংগ্রহ করা হয়। ধনপুদি তার প্রিয় মানুষকে জঙ্গল থেকে বেইনের সরঞ্জামগুলি এনে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে –

"দবেদা পুজত খৈ দিচ্ছোয়   বন্দুক মারি টাগিচ্ছোয়

সুচ্যকে বাশ তাগল্লক দা লৈ দিচ্ছোয়।" (তদবে, ৩০)

বাংলা অনুবাদ: দেবতার পূজোয় খই দিও   ভাল করে বন্দুক মেরো

দাদা কোমর তাঁতের সরঞ্জাম এনে দিও।

প্রেয়সীর মান রাখতে রাধামনও জুমের কাজের ফাঁকে এই সরঞ্জামগুলি জোগাড় করে এনে দেয়। চাকমা সমাজে মেয়েরা তেরো চৌদ্দ বছরে পা দেবার পর বেইন বোনা (কোমর তাঁত) শিখে নেয়। বেইন বোনায় পারদর্শী না হলে সচরাচর কোন যুবতী মেয়েকে বিয়ের উপযুক্ত বলে গণ্য করা হয় না। তাই ধনপুদি রাধামনকে বিয়ে করার মানসে নিজেকে বিয়ের উপযুক্ত প্রমাণের জন্য জঙ্গল থেকে এ সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করে এনে দেওয়ার

জন্য অনুরোধ করে। ধনপুদির ভীষণ ইচ্ছে ‘ফুল খাদি’ (আঁচল) বোনার। মনের ইচ্ছেটা সে তার মনের মানুষকে জানিয়েছে এভাবে –

“ঝাগে জুনি উড়ি যার   নালি ঘিস্যা কুড়েই যার

মর ওচ্ দা ফুল খাদি বুনিবার।” (তদেব, ৩০)

বাংলা অনুবাদ: জোনাকি পোকা উড়ছে   জুমের তিল ঝড়ছে

দাদা ফুল খাদি বোনার ভীষণ ইচ্ছে।

আলোচ্য ‘রাধামন-ধনপুদি পালা’য় দেখা যায়, প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণের উপর নির্ভর করে চাকমা নৃগোষ্ঠী জীবন ধারণ করে। প্রকৃতির অবাধ দান তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলে। জুমচাষ তাদের জীবনের অন্যতম অঙ্গ। জুমের ফসল বছরভর তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের যোগান দেয়। এপ্রসঙ্গে পালাকার বলেন-

“জুম লেজোত কুও কুরি   কাত্যা সুধ ব গরি” (তদেব, ১১)

বাংলা অনুবাদ : জুমের সীমান্তে কুয়ো তৈরি করে জলের অভাব মিটিয়ে নাও।

আলোচ্য পালায় চাকমা জাতির প্রচলিত খাদ্যাভ্যাসেরও উল্লেখ রয়েছে। প্রাকৃতিক উপায়ে সংগৃহীত তাদের খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে রেই শাক, লেলেম পাতা, কলার মোচা, উলু (চালতা), কালি কুচ্যাল (আখ), বেগেনো (ব্যঙাচি), মধু, ধুন্দ (তামাক), বেঙ (ব্যাঙ), বনসুপারি-বনপান (সুপারি-পান), ভাদ (ভাত), মদ, শুকরের মাংস, ইজ্যামাছ, কুদুক (সজারু), আলু, নারকেল, সুর্মি (সীম), ঘুমুরো (এক ধরণের পোকা), চিন্দিরে (চিনার), মাম্মারা (শশা) ইত্যাদি। বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি পঙক্তি নিম্নে তুলে ধরা হল -

"সুবরি কিনি আধাপন   রান্যা ভুইয়্য ঘণছণ

বদ্যেয়ে গেল্যাক পাড়াবন

সক্কে ধনপুদিরে কত্থে রাধামন।

চৈদে বৈঝেগে খরান দি   ধুন্দ বাজেই কলগি দি

তালা লগে চাবি দি

ন কানিচ্ দ্যে আর পরাণ বী।” (তদেব, ১০১)

বাংলা অনুবাদ: সুপারি কিনি আধাপন   জুমের মধ্যে ঘন ছন

বদ্যি করল পাড়াশুদ্ধ

তখন ধনপুদিরে বলে রাধামন।

চৈত্রের বৈশাখে প্রচণ্ড খরা   ভাল করে তামাক লাগা

কেঁদো না আর তুমি সোনা।

বা "কুড় ঝোগেহই শুও ধল্য গলি ভরন সুমি ধল্য

রাধামনে তা সমাছ্যাউনরে আ'র কুও ধল্য।

খর লগে নুন খাঙ ভাদ লগে তোন খাঙ

চোত মাস্য ভিধিরি শেষে গরিবং ভেইলেক ঘরকাম।

ছড়াত উজোদন গুদুং মাছ ফুণশিলা বেরোং গাছ

যগন পরিবগি বিঝুকে মাস।”(তদেব, ৬৫)

বাংলা অনুবাদ: উঠোনের মোরগ তাড়াল মাচাভর্তি সীম পাড়ল

রাধামন তার বন্ধুদের বলল

টকের সঙ্গে লবন ভাতের সঙ্গে সবজি

চৈত্র মাসের মধ্যে তৈরি করবো বাড়ি।

ছড়ার মধ্যে লাঠি মাছ চিরুনির শলা বেরো গাছ

যখন শুরু হবে বৈশাখ মাস।

চাকমাদের সমাজ জীবনে শিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। গুলতি, তীর-ধনুকের মাধ্যমে তারা পাখি, হরিণ, বাঘ, হাতি ইত্যাদি শিকার করে। পালায় দেখি–

“ধুমত দিলুং বেতে তারা যাদন গাবুরে প্যখে মারা” (তদেব, ২৭)

বাংলা অনুবাদ : “চুলোর ধোঁয়ায় দিলাম বেতের তাড়া পাখি মারতে যাচ্ছে যুবকেরা”

প্রতিটি কৌম গোষ্ঠীর মতো চাকমা সমাজেও মঙ্গল অমঙ্গলের প্রতি গভীর বিশ্বাস রয়েছে। তাই যেকোন শুভ কাজ শুভদিন দেখে শুরু করার রীতি চাকমা সমাজে প্রচলিত। জুমের সীমানা নির্ধারণ চাকমা সমাজে একটি শুভ কাজ হিসেবে বিবেচ্য। তাদের বিশ্বাস পূর্বপুরুষেরা যে বিধান দিয়ে এসেছেন তাঁর অন্যথা ঘটলে অমঙ্গল নিশ্চিত। আলোচ্য পালায় তাই দেখা যায়, রাধামন ও তার সঙ্গীরা জুমের সীমানা নির্ধারণ করার আগে আজু (দাদু) চলাবাবের ‘যাত্রা বচন’ শোনার পর রওনা দেয়।

“রবি শুক্রে পুগে নিধি

বুধে বৃসুধে উত্তরে নিধি

সম শনি পঝিমে যায়

দগিন যাত্রা বুধে পায়”(তদেব, ২৮)

বাংলা অনুবাদ : রবি ও শুক্রবারে পূর্বদিকে যাওয়ার বিধান

বুধ ও বৃহস্পতিবারে উত্তর দিকে যাওয়ার বিধান

সোম ও শনবিারে পশ্চমি দকিে যাওয়ার বধিান

বুধবারে দক্ষণি দকিে যাওয়ার বধিান।

চাকমাদরে জাতীয় উ□সব বঝিু। এই উ□সব তাদরে জীবনে অন্যমাত্রা নয়িে আস।ে সারা বছররে ক্লান্তি লাঘবরে জন্য এই উ□সবরে ব্যবস্থাপনা। চত্রৈমাসরে শষেরে দুই দনি এবং বশৈাখরে প্রথম দনি এই তনিদনি ধরে চলে বঝিু উ□সব। যথা- ‘ফুল বঝিু’, ‘মূল বঝিু’ এবং ‘গচ্যে পচ্যে বঝিু’। এই উ□সব প্রসঙ্গে পালাকার বলনে –

“মাঘে ফাগুনে ফল্যে ইণ বারজ্যিা সুমি ধরি ছনি

এচ্যা এস্যে সে দন্নি বঝিু দনি।”(তদবে, ২৩)

বাংলা অনুবাদ : “মাঘ ফাল্গুন মাসরে তুষার বর্ষার সীমরে অতুলনীয় বাহার

আজকরে বঝিু দনিটি সবার।

অথবা “ডগররে পখ্যে চগিং চগিং দারু তুলি হরণি শগিং

নত্তিতি তুলি মাবং ঈণ বঝিু হল তন্নিো দনি”(তদবে, ২৩)

বাংলা অনুবাদ : চগিং চগিং চগিং করে ডাকছে পাখি ওষুধ হসিবেে হরণিরে শগিং তুলে রাখি

নক্তিি মাপে ওজন করি তুষার তনি দনিরে বঝিু সবার।

চাকমারা নৃত্য-সংগীত প্রয়ি। 'রাধামন-ধনপুদি পালা'য় চাকমাদরে সাংস্কৃতকি জীবনরে অঙ্গ ধুদুগ, খংেগ্রং, বাঝঁি, ঢোল ইত্যাদি লোকবাদ্য যন্ত্ররে প্রসঙ্গ এসছে।ে খংেগ্রং সম্পর্কে পালাকাররে সজীব দৃষ্টভিঙ্গরি পরচিয় পাওয়া যায় যখন তনিি বলনে -

"মাদি মলি চংে গরং আগুন লুরলে বঙে ধরং

সে সময়ত গাবুর মলিাউনে ববোক খংেগ্রং”(তদবে, ১১)

বাংলা অনুবাদ : নরম মাটি উঁচু করি মশাল দয়িে ব্যাঙ ধরি

সে সময়ে যুবতীরা বাজাবে খংেগ্রং দ্রি দ্রি

চাকমাদরে মধ্যে নানাধরনরে খলোধুলার প্রচলন রয়ছে।ে নানা বয়সরে শশিু, কশিোর-কশিোরীরা এইসব খলোয় সক্রয়িভাবে অংশগ্রহণ কর।ে আলোচ্য পালায় চাকমা সমাজে প্রচলতি ‘নাদং হারা’, ‘ঘলিে হারা’, ‘কত্তি হারা’, ‘সজেক হারা’ প্রভৃতি লোকক্রীড়ার উল্লখে রয়ছে।ে ‘সজেক হারা’ সম্পর্কে পালাকার বলছেনে -

"সজেক খারাত কমে ভাঙে বারজ্যিা গাঙে পার ভাঙে”(তদবে, ১৭১)

বাংলা অনুবাদ : সজেক খলোয় বতে ভাঙে বর্ষাকালে নদীর পার ভাঙে

বা "মন উললাসে তরঙ্গ বলো বয়েয়া সারঙ্গ

মলিয়ে মদ্দে ঘলি খোরা ওল আরম্ভ।"(তদবে, ১৭)

বাংলা অনুবাদ : মনরে উল্লাস তরঙ্গ বাজাচ্ছে বলো সারঙ্গ

ছলেে ময়েরে ঘলি খেলো হল আরম্ভ।

ববিাহরে মধ্যে দয়ি যে কোেন জাত গোেষ্ঠীর সমাজ জীবনরে নানা ধরনরে রীতি-নীতি সংস্কার-বশ্বিাসরে রূপ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠে। আলোেচ্য পালায় চাকমা সমাজরে ববিাহরে রীতি-নীতি সংস্কাররে সুন্দর বর্ণনা দয়িছেনে পালাকার। যা চাকমাদরে সামাজকি ইতহিাসরে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

চাকমা সমাজ ব্যবস্থা পতিৃতান্ত্রকি। সমাজরে প্রধান হচ্ছনে রাজা। প্রাচীনকালে কোেন এক সময় খীসা, দওেয়ান পদবীধারী ব্যক্তরিা রাজার অধীনে থকেে নজি নজি গ্রামরে সমাজ ব্যবস্থার মূল ধারক ও বাহক হসিবেে কাজ করছেনে। 'রাধামন-ধনপুদরি পালা'য় চাকমাদরে প্রাচীন সামাজকি প্রথা ও সংস্কৃতকি ঐতহি্যরে সন্ধান মলেে। চাকমা সমাজে ববিাহ উপলক্ষ্যে পাত্রপক্ষরে কন্যাকে টাকা-পয়সা, সোেনারূপা প্রদানরে রীতি প্রচলতি ছলি। রাধামনরে সঙ্গে ধনপুদরি প্রমে-ভালবাসা থাকার পরও ধনপুদরি মা-বাবা তাদরে একমাত্র কন্যার ভালবাসাকে উপকে্ষা করে প্রতবিশেী এক ধনাঢ্য ব্যক্তরি ছলেরে সঙ্গে তার বয়িে দতিে রাজি হয়। এখানে চাকমাদরে অতীত সমাজ ব্যবস্থায় বয়িতেে পাত্র-পাত্রী নর্বিাচনে মা-বাবার সদ্ধিান্তই চূড়ান্ত বলে মানা হয়। আগকোর দনিে মা-বাবা বা অভভিাবকরে অমতে ছলেে ময়েরো কউেই ববিাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না। যদি সরেকম পরস্থিতিি সৃষ্টি হত তাহলে সে বয়িে অবধৈ বলে গণ্য করা হতোে। অবধৈ বয়িে হলে সামাজকি দণ্ডে উভয়কে দণ্ডতি করার নয়িম রয়ছেে, পাশাপাশি ছলেে ময়েে দুজনকইে বচ্ছিন্নি করে রাখা হতোে। সমাজরে নয়িম অনুযায়ী আনুষ্ঠানকিভাবে নর্ধিারতি সময়রে মধ্যে পর পর তনিবার পাত্ররে জন্য পাত্রীর অভভিাবকরে কাছে গয়িে কথাবার্তা ঠকি রাখতে হয়। পালায় দখো যায়, ভোেলানাদরে জন্য ধনপুদরি মা-বাবার কাছে পর পর তনিবার আনুষ্ঠানকিভাবে বয়িরে প্রস্তাব ও যোেগাযোেগ করা হয়ছেে। এতে ধনপুদরি মতকে প্রাধান্য দওেয়া হয় না। পতিৃতান্ত্রকি সমাজ ব্যবস্থার কারণে চাকমাদরে বয়িরে অনুষ্ঠান সচরাচর বররে বাড়তিে সম্পন্ন হয়। তাই চাকমা সমাজে মূল বয়িে পাত্ররে বাড়তিে হয়। 'চুমুলাং' পুজোের মাধ্যমে এই বয়িে সম্পন্ন হয়। বয়িরে পূর্বে সামাজকি অনুষ্ঠানাদি যমেন – পাত্র পক্ষরে পাত্র নর্বিাচন করা, বয়িরে দনি ধার্য করা প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তারপর বয়িরে মূল পর্ব 'চুমুলাং' পূজা শুরু হয়। 'চুমুলাং' পুজোেয় পাত্রীকে কলসি বা কটেলি দয়িে জল আনতে হয়। এই জলই পুজোের মূল উপাদান। এই জল নয়িে পাত্রীকে সোেজা পাত্ররে বাড়তিে ঢুকতে হয়। এই জল নদী বা কুয়োে থকেে আনতে হয়। মাঝপথে পাত্রী যদি কারোে বাড়তিে ঢুকে যায় তাহলে যার ঘরে ঢুকে সইে ঘররে উপযুক্ত ছলেরে সঙ্গে পাত্রীর বয়িে হয়। এজন্য চুমুলাং পুজোের জল আনতে যাওয়ার সময় পাত্রীর সঙ্গে অনকেে লোেক থাকে। পালায় দখো যায়, ধনপুদরি বয়িে প্রথমে ভোেলানাদরে সঙ্গে ঠকি হয়ছেলি। ধনপুদি ও রাধামনরে মধ্যে সম্পর্ক থাকলওে অভভিাবকরে কথায় ভোেলানাদরে সঙ্গে বয়িতেে ধনপুদকিে রাজি হতে হয়। মন সায় দচ্ছিে না এই বয়িতেে। শষেপর্যন্ত আজু (দাদু) চলাবাবরে শরণাপন্ন হয় ধনপুদি। তখনই আজু (চলাবাব) চুমুলাং পুজোের জল আনার পথে রাধামনরে বাড়তিে ধনপুদকিে ঢুকে পড়ার বুদ্ধি দয়িে। সইে মোেতাবকে –

"বাশ্যুন কাবি বান'গৈ মোেষ্যুন আনি বান্যে'গৈ

গচ্যিা গরি সইে জয়মঙ্গল ঘরত ধনপুদি উঠ্যে' গৈ।"(তদবে, ১১১)

বাংলা অনুবাদ : বাঁশ কটেে করোে জড়োে মহষি এনে এক করোে

তাড়াতাড়ি করে ধনপুদি জয়মঙ্গলরে ঘরে ঢুকল।

ধনপুদি জলপূর্ণ কলসি নিয়ে রাধামনের বাবা জয়মঙ্গলের বাড়িতে যায় এবং জয়মঙ্গলের আশ্রয় প্রার্থনা করে। জয়মঙ্গল সাদরে পুত্রবধূ হিসেবে ধনপুদিকে গ্রহণ করে এবং প্রতিবেশীদের জানায় তার বাড়িতে লক্ষ্মী এসেছে। ধনপুদিকে পুত্রবধূ হিসেবে পেয়ে রাধামনের বাবা জয়মঙ্গল খুশিতে আত্মহারা। রাধামন আর ধনপুদির ভালবাসা এভাবে পূর্ণতা পেল। এদিকে ভোলানাদের বাবা সমাজপতির কাছে বিচারপ্রার্থী। সব মাতব্বর কারবারিরা জমায়েত হলেন। কিন্তু তাদের কিছু করার নেই। নিয়ম তো নিয়ম। সামাজিক সালিশি সভা বসে। সভার রায়ে জয়মঙ্গল ভোলানাদের বাবাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন। এই নিয়ম সুদীর্ঘকাল ধরে চাকমা সমাজে চলে আসছে। তাই সমাজপতিরা নিয়মের কাছে পদানত হতে বাধ্য। রাধামন-ধনপুদির বিয়েতে আর কোন বাঁধা রইল না। উপরিক্ত বিবাহ প্রথা চাকমা সমাজে এখনো প্রচলিত এবং প্রথা অনুযায়ী বিয়ের চূড়ান্ত পর্বে বরের বাড়িতে কনে চুমুলাং পূজার জন্য কলসি নিয়ে নদীর ঘাট বা গ্রামের কুয়ো থেকে জল আনার জন্য যায়। তখন কনের সঙ্গে অবশ্যই আট নয় জন সঙ্গী থাকে। যাতে কনে পথ ভুলে হারিয়ে না যায় বা অন্য ঘরে যেতে না পারে।

নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হলেও বেশিদিন তাদের একসঙ্গে থেকে নবীন দাম্পত্য জীবনের সুখভোগ সম্ভব হয় নি। রাজাজ্ঞা পালন করার জন্য রাধামনকে যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি নিতে হয়। চোখের পলকে সেই দিনগুলি চলে আসে আর রাধামন যুদ্ধে যোগদান করার জন্য রওনা হয়। আর এদিকে ধনপুদির গর্ভে তার সন্তান বড় হতে থাকে। রাজা বিজয়গিরির সেনাপতি হিসেবে সে অভিষিক্ত হয়। বাড়িতে শুধু আজু (দাদু) চলাবাব আর বেবেই (দিদিমা) চলা মা। রাতে ধনপুদির প্রসব যন্ত্রণা শুরু হলে আজু(দাদু) চলাবাব ওঝা নয়েযমোকে ডাকতে যায়। ধনপুদির মনে স্বামীর অনুপস্থিতির দুঃখ। তার স্বামী বাড়িতে থাকলে আজ বয়স্ক লোকটার (দাদু) কষ্ট করতে হত না।

“বনত ডগরের বন পুক   ধান হল উজুক চুক

চলাবায় অঝা হঝা যেই এন্দি ধনপুদি তুল্যে মনদুখ

ভাদে রানি খিয়ে সদে   গাঝত উদি থিয়ে জেদে

ধনপুদি আভিলিচে গরত্থে, ঘরত যদি মির নেকে থেদো।”(তদেব, ১৩৩)

বাংলা অনুবাদ : বনে ডাকছে বনপোকা   ভর্তি হল ধানের গোলা

চলাবাবে ওঝা আনতে গিয়ে ধনপুদির মুখ হল ফোলা

রান্না করা ভাত খেয়ে যেতে   গাছে উঠে কিছুক্ষণ থেকে যেতে

ধনপুদি বিলাপ করছে আজ যদি আমার স্বামী বাড়ি থাকত।

এইপংক্তিমালায় দাদুর প্রতি ধনপুদির অগাধ ভালবাসা যেমন ফুটে উঠছে, ঠিক তেমনি স্বামীর অবর্তমানে পরিবারের যে বেহালদশা তার চিত্রও আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ওঝা নয়েযমোর সহায়তায় ধনপুদি পুত্র সন্তান প্রসব করে। রাধামন যুদ্ধে যাওয়ার আগে তার গর্ভস্থ সন্তানের নামকরণ করে যায়। ছেলে হলে সারাধন আর মেয়ে হলে সারাবি–

“উদনত লামি খারা খন   তুবি নিলি ঘিরাঘন

মরদ হলে নাঙ থৈ দিদিং সারাধন।

দারু বাদি পারা দি   তালা লগে চাবি দি

মিলা হলে থৈ দিবা সারাবি।।”(তদেব, ১৩৮)

বাংলা অনুবাদ :   উঠোনে নেমে করে খেলো   ঘন করে দেবে বেড়া

ছেলে হলে সারাধন নাম রাখবে তোমরা।

ওষুধ বানাবে পারা দিয়ে   তালা রাখবে চাবি দিয়ে

সারাবি নাম রাখবে হলে মেয়ে।।”

চাকমা সমাজে নবজাতক একমাস হলে শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান করা হয়। একমাসের আগেও করা যায়। সেটা নিদেনপক্ষে। নবজাতকের নাভি ঝরে পড়লে আর মা যদি সুস্থ থাকে তাহলে এই অনুষ্ঠান করা যায়। এই অনুষ্ঠানকে চাকমা ভাষায় ‘কজই পানি’ বলা হয়। এই অনুষ্ঠানের আগে মা ও নবজাতক কারো বাড়িতে ঢুকতে পারে না। সে কথা পালায়ও রয়েছে। ধনপুদির কথায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে –

“চোলুন ঝাড়ি কুড়ো ওল   গাছ্য কাবি খারি ওল

ধনপুদি কিত্থে গুরোবো হয়্যে’ দ্য এচ্যে একমাস ওল

তয়ো সুধ কারতুং নয়   ভাত্তুন রানি বাত্ত নয়

কজই পানি নি দিলে মুই কায়র ঘরত উদি পাত্তুং নয়।” (তদেব, ১৩৮)

বাংলা অনুবাদ : চাল ঝেড়ে জমানো হল   গাছ কেটে রাখা হল

ধনপুদির কথায় নবজাতকের বয়স একমাস হল

সুতা থেকে আর সুতা হবে না   রান্না করা ভাত আর বাড়বে না

শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান না করলে আমি কারো ঘরে যেতে পারবো না।

বাচ্চাদের ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো সব জাতির মধ্যে বিদ্যমান। চাকমারাও ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানেও তা চোখে পড়ে। ঘুম পাড়ানি গান বিশেষত দাদু, দিদিমা এবং বয়স্ক লোকেরা গেয়ে থাকেন। পালায় দেখি আজু (দাদু) চলাবাবে ধনপুদির ছেলেকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে গেয়ে ঘুম পাড়ায়। ঘুম পাড়ানি গানকে চাকমা ভাষায় ‘অলি’ বলা হয়। কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ নিম্নে করা হল -

“অলি অলি অলি বাবুধন অলি অলি অলি

দুলোনত পড়ি ঘুম যা না তুই লক্ষী গরি পিড়ি

কলা কিনি মালা কিনি আর কিনি লাডু

বাজারত গেলে আনি দিমি মুই রূব হাদ খারু।” (তদেব, ১৩৮)

বাংলা অনুবাদ :   অলি অলি অলি বাবুধন অলি অলি অলি

তুমি লক্ষ্মীমন্ত হয়ে দোলনায় ঘুমিয়ে পড়

কলা কিনে মালা কিনে আর কিনে নাড়ু

বাজারে গেলে এনে দেবে রূপার তৈরি খাড়ু।

চাকমারা লৌকিক চিকি□সা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। এই পালায় যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময়ে আজকের মতো চিকি□সা ব্যবস্থা উন্নত ছিল না। এই কারণে গুণীন, ওঝা, বৈদ্যের উপর তারা নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানেও প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষেরা পুরানো পন্থায় বিশ্বাসী। পালাকার বলেন-

"গুণে মন্দরে বৈদ্যেবুয়া পুও ধছ্যে ওঝাবুয়া" (তদেব, ১৯)

বাংলা অনুবাদ : বৈদ্যেরা গুণে মন্ত্রে পারদর্শী ওঝারা প্রসব করাতে সাহসী।

গুণমন্ত্রের দ্বারা নানা অসুখ সারিয়ে দেয় বৈদ্যেরা। মন্ত্র ছাড়াও বৈদ্যেরা নানা ধরণের জঙ্গলের লতা পাতাকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। চাকমা সমাজে নারীদেরও বিশেষ স্থান রয়েছে। নারীরা ঘরের কাজের পাশাপাশি জুমের নানাধরনের কাজ ও ওঝার কাজেও নিজেদের যুক্ত করে। সন্তান প্রসব করায় ওঝারা। উল্লেখ্য এই ওঝারা নারী ওঝা, সুস্থ ও সবল সন্তান প্রসব করানোর দায়িত্ব এই নারী ওঝাদের। পালায় ধাত্রী নেয়্যেমো'র কথা রয়েছে। সে ধনপুদিকে প্রসব বেদনা থেকে মুক্তি দেয় এবং সুস্থ, সবল পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে সহায়তা করে। মধ্যরাতে দাদু চলাবাব ধাত্রী নেয়্যেমো'কে আনতে গেলে সে বিনাবাক্যে তার সঙ্গে যেতে রাজি হয়। নিজের দায়িত্ব সে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে। বয়স্ক চলাবাবের কষ্টে সেও ব্যথিত হয়। চলাবাবের মুখে ধনপুদির প্রসব বেদনার কথা শুনে সে আর কালবিলম্ব করেনি। তার উল্লেখে পালায় রয়েছে –

"বন সুবরি বিন পান পুজ পাদি অঝা আন

চলাবাবর দুখদরদর কধা শুনি নেয়্যে মা তা কানয়িান,

ইজ্যা মাছরে চড় দিলাক বাজন্যা বেপোরি নি ললাক

আ চাড়য়িান হ্যাদত লৈ দ্বি জিনে হিঝা হিছ্যা লোর দিলাক।" (তদেব, ১৩৪)

বাংলা অনুবাদ : বনের সুপারি বনের পান পূজা উপলক্ষে ওঝা আন

চলাবাপের দুঃখের কথা শুনে নেয়্যেমোর মন ভেঙে খান খান

চিংড়ি মাছ ধরার জাল ফেলো ব্যাপারীরা নৌকা কিনিল

চলাবাপ আর নেয়্যেমো হাতে কাস্তে নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা দিল।

ওঝাদের জ্ঞান দেখার মতো। আসার পরই ধনপুদির সঙ্গে কথা বলে ওঝা ঝাড়ফুঁক করে বুঝে নিল প্রসবকাল আসন্ন। তাই সে ঘোষণা দিল –

"পত্থান কাবি ধুিও হভ দেবো কালা বয়োর ব

রান্যা জুম ছণ হভ উদল টানি কাজি হিভ

নয়েযমো কত্থে এচ্যা হামাক্ষায় ধনপুদরি মরদ পুয়া হভ।

বন্দুক মারি টাগবি দারু তুলি বাদবি

আর পুয়াবো হদে বচে্ সময় ন লাগবি।

মাধাত বানি কানয়িান ধারহেই আন্যং টাগলান

নয়েযমো কত্থে জাদি পাহত দ্য গরম পানয়িান।” (তদবে, ১৩৬)

বাংলা অনুবাদ : রাস্তা কাটি পরষি্কার কালো আকাশে বাতাসরে জোরজার

জুমে আছে ছনরে বাহারি জোরে টানি উদাল গাছরে দড়ি

নয়েযমো বলছে সন্তান প্রসবরে আর নহেি বশেি দরেি।

তাক করে বন্দুক মারবে ওষুধ এনে বটেে নবেে

সন্তান প্রসব হতে অল্প সময় লাগবে।

মাথায় বঁধে কাপড় ধার দয়িে টাক্কল

নয়েযমো বলছে শীঘ্রই আনো গরম জল।

এভাবে সন্তান প্রসবরে পর ওঝা নয়েযমো বাঁশরে ধার বতে দয়িে নবজাতকরে নাভি কটেে দয়ে। জানায় এই শশিুপুত্রটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত। গংখুলীর ভাষায় –

“লাভে লুও বয় অ-লাভে তুল’য়্য ন বয়

চাদে চাদে চলাবাব ক’ন কত্যেদে উিনো নহেি।

আল্যা কুণদে মিঘে বাড়ে মুও গুনে বঙে মরে

পরপিূর্ণ হইয়্যে পুয়াবো এক্কুবারে।” (তদবে, ১৩৭)

বাংলা অনুবাদ : লাভে লোহা করে বহন লোকসানে করে না তুলা বহন

দখেো দখেো চলাবাব নবজাতকটি খুঁতবহিীন।

ঈশান কোণে মঘে বাড়ে মুখরে জন্য ব্যাঙ মরে

শশিুটি পরপিূর্ণ হয়ে জন্মছে একবোরে।

আগকোর দনিে এই নারী ওঝারাই ছলিনে সন্তান প্রসবে একমাত্র ভরসা, অবলম্বন। তাদরে সদ্ধিান্তই চূড়ান্ত। বর্তমানে এই ওঝা বদ্যৈরে কদর অনকেটা কমে গছে।ে চকিি□সা ব্যবস্থার উন্নতি ও শক্ষিা দীক্ষার প্রসাররে

ফলে চাকমা জনজাতিদের মধ্যে এই ওঝা বৈদ্য ও গুণীনদের মর্যাদার অবনমন ঘটছে। এছাড়া সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাকমা জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটছে।

৪

‘রাধামন-ধনপুদি পালা’র কাহিনির একটি বড় অংশ জুড়ে ধনপুদির বারোমাসের দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই বারোমাসী বর্ণনায় প্রকৃতি ঘনিষ্ঠ আরণ্যক জীবনে, মানব মনে ঋতু বৈচিত্র্যের প্রভাবের দিকটিকে যেমন; তেমনি ধনপুদির মানস বিকাশের দিকটিকেও সমাজ বাস্তবতার নিরিখে বর্ণনা করা হয়েছে। ধনপুদির এই বারোমাসীই পরবর্তী সময়ে চাকমা গেংখুলীদের বারমাসী পালা রচনায় অনুপ্রাণিত করে। চাকমা বারমাসী পালাগুলি বর্ণনাত্মক রীতিতে ‘উভোগীদ’এর মাধ্যমে আরণ্যক জনপদে পরিবেশন করেন। উভোগীদ চাকমা জাতির নিজস্ব ও মৌলিক সুরধারা। বারমাসীগুলির অধিকাংশই প্রেমগীতিমূলক আখ্যান হলেও চাকমা সমাজের নানারূপ শোষণ-বঞ্চনা, আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির চিত্রও পালাগুলিতে বিধৃত।

তাছাড়া এই পালায় তাদের সমাজ জীবনে দীর্ঘদিনের আচরিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির চলনের কথাও বিধৃত হয়েছে। চাকমারা মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চাকমারা ভগবান বুদ্ধকে ‘গোজেনে’ বলে সম্বোধন করে। নিজ ধর্মে ও জীবনাচরণে তারা অটল ও অনড়। যেকোন কাজে তারা গোজেনকে স্মরণ করে। ধনপুদি ভাত রান্না করার আগে গোজেনকে উদ্দেশ্যে করে যেমন নমস্কার জানায় (তদেব, ৩১) তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে সে গঙ্গামারও স্তব করে। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির অন্যান্য দেবদেবীরাও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অঙ্গীকৃত হয়েছেন। এই পালায় মহাদেব, দুর্গা, লক্ষ্মী, বিষহরী প্রমুখ দেবদেবীর উল্লেখে এর প্রমাণ। আবার ‘ঘিল জন্ম কথা’য় চলবাপ রামের বনবাস গমন, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের পঞ্চবটি বনে আশ্রয় গ্রহণ, রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, রামের সীতা উদ্ধার, সীতা সমেত রাম লক্ষ্মণের অযোধ্যা আগমণ, প্রজাপুঞ্জের সীতার সতীত্ব নিয়ে গুঞ্জন এবং ‘ঘিলা কজুই’ দিয়ে সীতাকে পরিশুদ্ধ করার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। শেষোক্ত ঘটনাটি ছাড়া বাকি সবই রামায়ণের অনুসরণে বর্ণিত।”(তদেব, ২০) পুরাণের কাহিনি কিভাবে আরণ্যক জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল এই বর্ণনা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

৫

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, এই পালাগানে চম্পকনগরের যুবরাজ বিজয়গিরির বিশ্বস্ত ও প্রধান সেনাপতি রাধামন ও তার প্রেমিকা ধনপুদির অনবদ্য প্রেমকাহিনি বর্ণিত হলেও পালাকার সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করতে পারেননি। কারণ তিনি যে লোকজীবনকে আত্মীকরণ করে বেড়ে উঠেছেন, সেই লোকজীবনই তাকে প্রেরণা জুগিয়েছে পালাটি বাঁধতে। মৃত্তিকাশ্রয়ী সেই জীবনের নানা অনুষঙ্গ তাই এক বীর্যবান পুরুষের প্রেমকাহিনি বর্ণনায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। প্রসঙ্গক্রমে এজন্যই চাকমাদের জুমভিত্তিক জীবনের পাশাপাশি তাদের লোকবাদ্য, লোকক্রীড়া, খাদ্য-দ্রব্য, বিবাহের রীতিনীতি, লোকচিকিৎসা, ধর্মীয় বিশ্বাসের কথাও উঠে এসেছে। তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধ যে কতোটা গুরুত্বের দাবি রাখতো সে কথাও এই পালায় বর্ণিত হয়েছে। তাই নববধূকে ঘরে রেখে যুদ্ধযাত্রা করতে রাধামন পিছপা হয়নি। তবে সে যে এক বুদ্ধিমন্ত, বিবেকবান পুরুষ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় যুদ্ধযাত্রার প্রাককালে সন্তান সম্ভবা পত্নীর সন্তানের নামকরণ করে যাবার মধ্যে দিয়ে। এই নামকরণ বহু অর্থের দ্যোতক। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা, অন্যদিকে যুদ্ধের মতো অনিশ্চিত ক্ষেত্র থেকে জীবিত অবস্থায় ফিরে না এলেও সন্তান যাতে জানতে পারে তার পিতা তার এই নামকরণ করে গিয়েছিলেন। বাংলা ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যেও ধনপতি বাণিজ্যযাত্রার প্রাক্কালে তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর সন্তানের নামকরণ করেছিলেন। ধনপুদির সাপের বিষঝাড়ার মন্ত্রোচ্চারণেও ‘মনসামঙ্গল’-এর কথা পড়ে যায়।

গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে চাকমা পালাগানের বিষয়, আঙ্গিক এবং পরিবেশন রীতির সঙ্গে বাংলা মঙ্গলকাব্য, প্রণয়কাব্য বা গীতিকার মিল ও অমিল দুই-ই ধরা পড়বে। কিন্তু এগুলির পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার পরিসর বর্তমান প্রবন্ধে নেই। প্রস্তাবিত প্রবন্ধে তাই নির্বাচিত একটি চাকমা পালাগানের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে নৃগোষ্ঠীর সমাজমানসের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এ নিয়ে ভাবীকালে পাঠক গবেষকেরা যদি আগ্রহী হন এবং সংস্কৃতির চলনের মাত্রাকে উন্মোচিত করেন তাহলে আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

চাকমা, ইন্দুমাধব (২০১৪), রাধামন ধনপুদি পালা, দেড়েগাঙ সাহিত্যপত্র, পেচোরথল

সহায়ক গ্রন্থ

চাকমা, সুগত (১৯৮৩), চাকমা পরিচিতি, বরগাঙ পাবলিকেশন্স, রাঙ্গামাটি

শর্মা, নন্দলাল (২০০৮), "চাকমা ভাষা সাহিত্যের বিকাশে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন" অন্তর্ভুক্ত বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সম্পাদিত) পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা

Ishaq, Muhammad M.A. B.S.E.S (1971), Bangladesh District Gazetters, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh Government Press, Dacca.

Dr.Padma Kumari Chakma, ORCID: 0000-0002-0416-776X. is an Assistant Professor in the Dept.of Bengali, Tripura University. She can be reached at: padmachakma@tripurauniv.ac.in

Dr. Malay Deb, ORCID: 0000-0002-0927-0272, is an Assistant Professor in the Dept.of Bengali, Tripura University. He can be reached at: malaydeb@tripurauniv.ac.in